প্রজন্ম-ব্যবধানঃ আদর্শিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশ

নুর মোহাম্মদ কাজী

বাংলাদেশের রাস্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রবীণ ও নবীনদের ভেতর কোন প্রজন্ম-ব্যবধান (Generation Gap) সৃস্টি হয়েছে কি? হলে কেন হয়েছে? এ প্রশ্ন আমার মনে বহুবার এসেছে। প্রশ্নটির উত্তর আমি নানাভাবে খুজে পাবার চেষ্টা করেছি। দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীগণ এ ব্যাপারে অনেক লেখালখি করছেন। সমস্যার গভীরতা নিয়ে আলোচনা করছেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্নটির উপর গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

প্রজন্ম-ব্যবধান

মানুষই এক মাত্র প্রাণীকুল যারা কিনা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান ও সম্পদ পরবর্তি জেনারেশনের জন্য রেখে যেতে পারে। এ জন্য পৃথিবীর সকল জনপদ, জাতি এবং নৃ-জাতির মানুষই প্রবীনদের জ্ঞান ভান্ডার হিসেবে গন্য করে এবং নবীনরা প্রবীনদের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।প্রবীনদের প্রদর্শিত পথেই নবীনদের অগ্রযাত্রা সম্ভব। অন্য কোন বিকল্প পথ আছে কী না আমার জানা নেই। পারিবারিক জীবনে প্রবীন পিতা যেমন সন্তানের অগ্রগতির জন্য কিছু করে যাবার চিন্তায় সদা তাড়িত থাকেন, তেমনি জাতীয় জীবনে ও প্রবীন প্রজন্ম নবীনদের অগ্রগতির স্বপ্ন নির্মাণে সদা সতর্ক থাকেন। প্রবীনরা যদি তাদের সাধনার প্রাপ্তি নবীনদের কাছে যথাযতভাবে হস্তান্তর করে যেতে না পারে, সৃষ্ট ব্যবধানকে সূত্রবদ্ধ **(Bridging the Gap)** করতে ব্যর্থ হয়; তাহলে এর প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে মারাত্মক রূপ ধারন করতে পারে। এর ফলে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরে এবং

জাতিস্বস্মার উজ্জীবনী শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ভাবে সবল জাতি দুর্বল জাতিতে পরিনত হয়। আর দুর্বল জাতি সহজেই অন্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

এ প্রবন্ধে ১৯৭১ সালকে আমরা নবীন-প্রবীন সীমানা নির্ধারনী সাল হিসাবে গ্রহন করেছি। এ সাল মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মহান বিজয়ের সাল। যারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করার বয়সী ছিলেন তারা হলেন প্রবীন প্রজন্ম। এদের বয়স এখন পঞ্চাশের উর্দ্ধে(বয়স ৫০+)। এদেরকে আমরা স্বাপ্নিক প্রজন্ম (Dreaming Generation) বলতে পারি। আর যারা ১৯৭১ সালের পর জন্ম গ্রহন করেছেন, তারা হলেন নবীন প্রজন্ম। এদের বয়স ৩৭ এর নীচে (বয়স ৩৭-)। এদেরকে আমরা চ্যালিঞ্জিং প্রজন্ম (Challenging Generation) বলতে পারি।

স্বাপ্নিক প্রজন্ম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বাধীনতার আদর্শ নির্ধারন করেছিলেন। অংগীকার করে ছিলেন সাম্য, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। তারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের পরই কেবল চ্যালিঞ্জিং প্রজন্মের নিকট সাম্য, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে এসেছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর আদর্শ প্রতিষ্ঠা এক নয়। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ। বাংলাদেশের নবীন প্রজন্ম আজ কোন আদর্শ দ্বারা চালিত হচ্ছে? আমরা এখানে শুধু এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

যে প্রশ্নের উত্তর আজ ও খুঁজি

১৯৯৩ সাল। স্বাধীনতার ২২ বছর পরের কথা। আমি মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের সমাজ কল্যান বিভাগের একজন শিক্ষক। আমার ছাত্ররা

সকলেই নবীন প্রজন্ম। বয়স কারোরই ২২ এর উর্দ্ধে নয়। আমি কেবল তাদের সামনে প্রবীন প্রজন্মের লোক।এ ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছাড়াও তাদের সাথে আমার নবীণ-প্রবীণ সম্পর্ক রয়েছে।

একদিন ডিগ্রি ক্লাসে বাংলাদেশের সমাজ কল্যান নীতিমালার উপর লেকচার দিচ্ছিলাম।ছাত্রদের আমি বলেছিলাম, "রাস্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতেই সাধারনত সমাজ কল্যান নীতি মালা প্রণীত হয়।কল্যান রাস্ট্রের ধারনা পুজিবাদী ব্যবস্থার ধারনা জাত"। সিলেবাস অনুযায়ী আমি কল্যান রাস্ট্র হিসেবে যুক্ত রাজ্যের (U.K) সমাজ কল্যান নীতি মালাকে উদাহরন হিসেবে বর্ননা করেছি। লেকচার শেষে প্রশ্ন পর্বে একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, স্যার, আপনার লেকচারে বলেছেন বাংলাদেশ হবে একটি কল্যান মুলক রাস্ট্র। অথচ স্বাধীনতার পর আপনারা বলেছিলেন বাংলাদেশ হবে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তিশীল একটি সমাজতান্ত্রিক রাস্ট্র। আমরা কোনটি নেব? প্রশ্নটি শূনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এর উত্তর আমি সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে পরবর্তি ক্লাশে এ প্রশ্নের উপর বক্তব্য রাখব বলে সে দিনের মত ক্লাশ শেষ করলাম।

পরের দিনের ক্লাশে আমার লেকচার শুরুতে বললাম, "প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তির এক সুনিদৃষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে ছিলাম। তা ছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র গঠন। এখন আমি একজন শিক্ষক। আপনারা আমার ছাত্র-ছাত্রী। আপনাদের সাথে আমার সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার নয়। শিক্ষাদান আর শিক্ষা গ্রহনের পুরাতন ধারনা এখন বদলে গেছে। শিক্ষক কেবল জ্ঞানের বহুবিধ ধারনা গুলুকে

ছাত্রদের সামনে বিশ্লেষন করবেন।ছাত্ররা নিজেদের পছন্দ মত জ্ঞান রাজ্য থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান্ সংগ্রহ করবেন । জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আপনাদের ভুমিকাই মূখ্য। শিক্ষক হিসেবে আমার ভূমিকা সহযোগীতাকারীর (Facilitator)। কোন আদর্শ আমি আপনাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি শুধু আদর্শগুলো আপনাদের জন্য বিশ্লেষণ করতে পারি। কোনটি গ্রহন করবেন আর কোনটি করবেন না তা নির্ধারিত হবে আপনাদের নিজেদের জ্ঞান-সমৃদ্ধ সচেতনতায়।নিজকে সচেতন করা (Conscientization) আপনাদের নিজেদের কাজ।” গত ক্লাসে আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন স্বল্প বিশ্লেষণে এর উত্তর দান সম্ভব নয়। আপনারা জানেন, একটি রাস্ট্র গড়ে উঠে আদর্শ দ্বারা। আদর্শ ছাড়া রাস্ট্র চলতে পারে না। একটি জনপদের মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রামে শক্তিমানের আশ্রয় গ্রহন করে। শক্তিমানের আদেশ নির্দেশই কালক্রমে হয়ে উঠে উক্ত জনপদের আদর্শ। এ আদর্শই রাস্ট্র গ্রহন করে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা বাংলাদেশের আদর্শগুলো বিশ্লেষণ করতে চাই। বাংলাদেশের মানুষের আদর্শিক সংগ্রামের পর্যায় গুলুকে দু’ পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ ১) ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ।

ধর্মীয় আদর্শ

শক্তির (Power) সাধনা থেকেই আদর্শের উৎপত্তি। অসহায় মানুষ যুগে যুগে অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শক্তিমানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আসছে। বাংলাদেশের বর্তমান ধর্মীয় সম্প্রদায় সমুহের অতীত বিশ্লেষণ

করলে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাব। বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর জোয়াশীম কে, বূজের মতে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টাব্দ ১ম শতক পর্যন্ত দক্ষিন এ শিয়ার দেশ গুলুতে ধর্মীয় আদর্শ তেমন একটা দানা বাধতে পারেনি। এ সময় মানুষ শক্তির আধাঁর হিসেবে সূর্যকে প্রভু হিসেবে মেনে সুর্য পুঁজা করত। এর পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলের মানুষ শক্তির উৎস হিসেবে নানা দেব দেবীর পুঁজা অর্চনা শুরু করে। এ ভাবেই দক্ষিন এশিয়ায় সনাতন হিন্দু ধর্মের ভীত গড়ে উঠে। হিন্দু ধর্মের সাথে দ্বান্ধিক বিরোধের ফলে দক্ষিন এশিয়ার দেশ গুলোতে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয়। মহামতি বৌদ্ধ জীব জগতের প্রতি দয়া-মায়াকে শক্তির উৎস হিসেবে দেখেছেন।বগূড়ার মহাস্থানগড়কে রাজধানী করে বাংলাদেশে গংগারীড্ডি সভ্যতার পর বৌদ্ধ পাল রাজাদের নেতৃত্বে প্রথম ধর্মীয় সভ্যতার বিকাশ হয়। বাংলাদেশে হিন্দু সভ্যতার বিকাশ হয় সেন রাজাদের আমলে। দিল্লিতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পর ইক্তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্তে বাংলা দখলের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে তৃতীয় ধর্মীয় সভ্যতা- মুসলিম সভ্যতার সূচনা হয়।ব্রিটিশ বাংলার এ অঞ্চলে বানিজ্য করতে এসে গণবিচ্ছিন্ন সিরাজদৌলার হাত থেকে অতি সহজেই রাস্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়। ব্রিটিশ বনিকরা ক্ষমতাকে নিজ ধর্ম সভ্যতা বিকাশে ব্যবহার না করে বানিজ্য বিকাশে ব্যবহার করে ছিলেন। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনের জন্য তারা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভাজন নীতি (Divide and Rule) গ্রহন করলেন।দু'শ বছর এ নীতি সফল প্রয়োগ করে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের বাচাই করা রাজনীতিকদের কাছে ক্ষমতা হস্তানতর করে তারা নিজ দেশে চলে যান। এ পর্যায়ে ভারত গ্রহন করে ধর্ম নিরপেক্ষতার

রাস্ট্রীয় নীতিমালা আর এর বিপরীতে পাকিস্তানের রাজনীতিকগন ইসলামিক রাস্ট্রীয় নীতি মালা গ্রহনের ঘোষণা দেন|এদিকে এ সময় ইউরোপের প্রতিটি দেশ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ধর্ম রাস্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করে সকল ধর্মের সহাবস্থানকে সহনীয় করার টার্নিং পইয়েন্ট রেনেসার (Renaissance) আন্দোলনে সফলতা অর্জন করে ফেলেছে|

ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ

এ সময় (১৯৪৭) পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী উপনিবেশিক ধারাবাহিকতা (বিভাজনের দ্বারা শাসন নীতি) রক্ষার লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শ কায়েমের ঘোষণা দিলেন এবং তদনুযায়ী রাস্ট্রের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যেগী হলেন| অপর দিকে ভারতের শাসক শ্রেণী ইউরোপীয় রেনেসার আদর্লে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাস্ট্র হিসেবে ঘোষ্ণনা দিলেন| আর রাস্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহন করলেন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিকতাবাদী ধারনাকে| এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের শাষক শ্রেণীর পশ্চাৎপদতার দিকটি যখন বাংলার মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখদিল তখনই আন্দোলনের সূচনা হল|পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী ধর্ম দ্বারা শোষনের পরিকল্পণার বিরুদ্ধে বাংলার ধর্মীয় মাণূষেরা সবার আগে জেগে উঠল| ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর নিপীরণের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন বাংলাদেশ| এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ লড়াকু বাংগালী ভাই বোনকে আমরা হারিয়েছি|এরা সকলেই পাকিস্তানী শোষক শ্রেণীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন| এখন প্রশ্ন হল এ বিরাট আত্মত্যাগের পিছনে কোন আদর্শ কাজ করেছিল কি?

ষাটের দশকের শেষের দিকে দুই মহাশক্তির (আমেরিকা ও রাশিয়া) মধ্যকার দ্বন্ধবিরোধ এবং ভারতের পুর্বাঞ্চলের নকশাল আন্দোলনের এক

বিশেষ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।এ সময়টি ছিল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল আন্দোলনের যুগ।পুঁজিবাদের বিপরীতে মানুষ এ সময় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ়বাদী চেতনার দিকে ঝুকে পড়ছিল। এ সময় ভারতের পশ্চিম বংগসহ বহু রাজ্যে সমাজবাদী শক্তি ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাপ্নিক প্রজন্ম এ সময় স্বপ্ন দেখেছিল সাম্য, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের। প্রতিবেশীদের প্রগতিবাদী আন্দোলনের সাথে আমাদের যুবকরা ও একাত্মতা ঘোষণা করে ছিল। ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে যেমনি করে একদিন ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা জ়েগেছে, আমরা সে ভাবে জেগে উঠব। ভারত আমাদের প্রতি বেশী দেশ। এ দেশের ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন থেকে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারব না; পিছিয়ে থাকতে পারব না। অগ্রগতির স্বার্থেই আমাদেরকে প্রতিবেশী সংগ্রামী মানুষদের সাথে থাকতে হবে।১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশ থেকে আশ্রয় গ্রহনকারী অসহায় মানুষদের বড় আশ্রয়দাতা ছিল পশ্চিম বংগ, আসাম, ত্রিপুরার এবং মায়ানমার জ়নগণ ও সরকার।

পরিশেষে

স্বাপ্নিক প্রজন্মের মানুষ হিসেবে আমি বলতে চাই, যারা বড় স্বপ্ন দেখে তারা ছোট স্বপ্ন দেখতে পারে না। যারা আমরা জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন দেখে ছিলাম, তারা ব্যাক্তিস্বার্থ অথবা পারিবারিক স্বার্থকে বড় করে কখন ও দেখতে পারি নাই। যারা আমরা সত্যিকারে সাম্য, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলাম তারা আজ ও পরিবর্তিত হতে পারিনি।

আমাকে কেহ যদি বলে, “আসুন সাম্যের বিরুদ্ধে যাই”। আমি বলব, “ না, আমি পারি না”। আমাকে যদি কেহ বলে, “আসুন দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যাই”, “আমি বলব আমার লাশ যাবে, আমি যাব না”। আমাকে কেহ যদি গণতন্ত্রের বিপক্ষে যাবার হাতছানি দেয়, ‘আমি বলব দেখুন, আমার যৌবন কেটেছে গণতন্ত্রের সংগ্রামে ঢাকার রাস্তায়, আমি পারি নাই মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিতে”। আমি সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াকূ সৈনিক। আমার পথ বিজয়ীর পথ। গন মানুষের পথ, সংগ্রামী মানুষের পথ। চ্যালিঞ্জিং প্রজন্মের নিকট আমরা সাম্য, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী পথের দিশা রেখে যেতে চাই। এটা আমাদের স্বাপ্নিক প্রজন্মের নীতি। চ্যালিঞ্জিং প্রজন্ম এ নীতিকে গ্রহন করে আগামীদিনের পৃথিবী গড়বে–এখানেই দু’ প্রজন্মের সেতু বন্দনের মধ্য রেখা।চ্যালিঞ্জিং প্রজন্ম কি আমাদের এ নীতি মালা গ্রহন করেছে? না। চ্যালিঞ্জিং প্রজন্ম আজ আদর্শিক বঞ্চনার স্বীকার। সংগ্রামশীল নীতিমালা থেকে বঞ্চিত। সংগ্রামী উজ্জীবনী শক্তি থেকে বঞ্চিত।